International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2025; 2(6): 206-211
© 2025 IJMH
www.themultijournal.com
Received: 11-12-2025
Accepted: 29 -12-2025
Publish : 30-12-2025

Siddhartha Mukherjee
(Department of History),
Former Student of University of-
Burdwan, and NSOU.

Correspondence:
Siddhartha Mukherjee
(Department of History),
Former Student of University of-
Burdwan, and NSOU.

স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা ১৯৫২-১৯৭৭

Siddhartha Mukherjee

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19429210

Abstract (সারসংক্ষেপ)
দীর্ঘ সময় ঔপনিবেশিক শাসনের পরে ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীন হল, তখন গণতান্ত্রিক কাঠামোতেই গড়ে উঠল, আধুনিক ভারতের শাসন প্রণালী, সে মতোই সংবিধান কার্যকর হল ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি। আর এই গণতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্বাচন এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে পরিস্ফুট হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই সাধারণ জনগণ শাসক চয়ন করার ক্ষমতা পায়। সমসাময়িক ইতিহাস (Contemporary History) চর্চায় তাই নির্বাচনের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাস কেবল রাজ্যের শাসক চয়নে জনমত সমর্থনের ইতিহাস নয়। এই ইতিহাস ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পরপর চারটি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শাসন ক্ষমতায় একাধিপত্য কায়েম রাখার ইতিহাস, এই কালপর্বে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রফুল্ল ঘোষ, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়, ও প্রফুল্ল সেনের শাসনকালের ইতিহাস। কংগ্রেসের দুর্বলতা প্রকট হওয়ার ইতিহাস, এই সময় কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেসের জন্ম নেবার ইতিহাস। জোট রাজনীতির নেতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি ও উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উত্থানের ইতিহাস।
একদিকে যেমন বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেসে দলগত ভাবে এ হেন ভাঙ্গা গড়া -খেলার ঘূর্ণনে আবর্তিত হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বামপন্থার মধ্যেও আদর্শগত সংঘাত সর্বসমক্ষে চলে আসে।
১৯৬৪ সালে সিপিআই (এম) পার্টি গঠন ও সমসাময়িক কৃষক আন্দোলন হিসেবে নকশালবাড়ি আন্দোলন ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ইতিহাসের এক অনবদ্য অধ্যায়। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যেই এই রাজ্যে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম নির্বাচন, সাথে রাষ্ট্রপতি শাসন, অল্প সময়ে শাসক বদলের ফলে রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা, রাজ্য রাজনীতির আবহাওয়া কে উত্তপ্ত করে তোলে। অবশেষে ১৯৭২ সালে সপ্তম বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসের জয় লাভে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও, নানা আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, বাংলার রাজনীতি থেকে কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক অধ্যায় কে প্রায় সমাপ্ত করে দেয়। অবশেষে ১৯৭৭ সালে অষ্টম বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামপন্থীজোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাজ্য রাজনীতির ইতিহাস কে অন্য খাতে প্রভাবিত করতে থাকে, তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

Keywords পশ্চিমবঙ্গ, বিধানসভা নির্বাচন, নির্বাচনী ইতিহাস, জাতীয় কংগ্রেস, জোট রাজনীতি, বামপন্থী সংগঠন।

ভূমিকা (Introduction)

সাল ১৯৪৭, ১৫ ই আগস্ট দীর্ঘ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের পর ভারত স্বাধীন হলেও দুর্বল অর্থনীতি ও দেশভাগ, সাথে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সব থেকে বেশি প্রভাবিত করল বঙ্গভূমিকে। তখন বাংলা ভাগ হয়ে গেছে, তাই বলা যায় দেশভাগের ফসল হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গের আবির্ভাব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাসের এ যেন এক অন্ধকার অধ্যায় স্বরূপ। ১৯৫০ সালে ২৬ শে জানুয়ারি সংবিধান কার্যকরী হওয়ার পর, একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা অন্যদিকে কংগ্রেসের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার্থে ১৯৫২ সালে আয়োজিত হয় ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ ও এই নিয়মের বাইরে ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২ সালের বিধানসভা নির্বাচন যেমন জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক জয় কে সুনিশ্চিত করেছিল, তেমন ১৯৬৭ সালে বিধানসভা নির্বাচন জাতীয় কংগ্রেসের দুর্বলতা কে প্রকাশ করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অসন্তোষ ও জোট সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ সালের নির্বাচনী ইতিহাসের প্রবাহ কংগ্রেসকে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনের সুযোগ দেয়। ইতিমধ্যেই ততদিনে বামপন্থী সংগঠনগুলি নানা আর্থসামাজিক কারণ ও অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতাকে নির্বাচনী প্রচারের হাতিয়ার করে নিজেদের শক্তিশালী করে ফেলেছিল। অবশেষে ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

রাজনৈতিক বিচারধারার পরিবর্তন আসে, অর্থাৎ বামপন্থার জয় সুনিশ্চিত হয়। এই জয় কোন সাধারণ ঘটনা নয়, এই জয় ছিল মতাদর্শের জয়, যার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, তাই ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পরপর রাজ্যের সাতটি বিধানসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক জয়ের ইতিহাস অক্ষুন্য ছিল।

এই গবেষণা পত্রে পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭সাল অর্থাৎ ১ম থেকে ৮ম বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে পটভূমি থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক পঠপরিবর্তন, মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফলাফলের তুলনামূলক ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয়।

সাহিত্য পর্যালোচনা (literature Review)

স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্রমপর্যায় এবং নির্বাচনী রাজনীতি নিয়ে বেশ কয়েকজন গবেষক ও পন্ডিত গবেষণা করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন, যেমন রাজনৈতিক দলগুলির উত্থান পতন, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা দলীয় আধিপত্য এবং সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলন। তাঁদের গবেষণা গুলি রাজ্যের রাজনৈতিক গতিশীলতার বিবর্তন শাসন প্রণালী, নির্বাচন প্রবণতা, এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে।

ড. বাবুলাল বালা তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ "Congress in the politics of West Bengal from dominance to marginality 1947-1977" এ স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭সাল পর্যন্ত সময়কালে কংগ্রেস যে, একক দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখেছিল এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল, তা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬২ সালে ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর দলটি সংগঠনিক বিভাজনের কারণে এক গভীর সংকটে পড়ে। ড. বালা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ ও রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা। তিনি আরো বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে সিদ্ধার্থ শংকর রায় দলকে স্থিতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন কিভাবে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এই সংকট মোকাবিলায় সক্রিয় ছিল। এছাড়া, গবেষণায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ এবং নকশাল আন্দোলনের মতো প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

ড. রাখহরি চট্টোপাধ্যায় এবং পার্থপ্রতিম বসু সম্পাদিত" West Bengal under the Left 1977-2011" গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সময়কালীন শাসন ব্যবস্থা বিষয় ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বইটিতে বামফ্রন্টের উত্থান, নীতি প্রণালী, এবং পরবর্তী সময়ে পতনের কারণগুলিতে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

ড. বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তার গ্রন্থ "Indian politics and society since independence" এ স্বাধীনতার পর ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র এবং পরিচয় এবং রাজনীতি, ভারতের সংবিধান উদয়নতন্ত্র, ওয়েস্টমিনস্টার মডেল, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, জোট রাজনীতির উত্থান: প্রেক্ষাপট বিশেষণ করেছেন।

রণবীর সমাদ্দার তার "passive revolution in West Bengal: 1977-2011" গ্রন্থে ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১১ সাল এই কাল পর্বের বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি ও দল, সংগঠন, গণ-আন্দোলন, ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতি, নাগরিক সমাজ ও সমাজের রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সংকটের নির্যাস, অর্থনৈতিক বিকাশের বিকল্প পথের বিষয়ক দৃষ্টিপাত করেছেন।

সৌমেন ভট্টাচার্য তাঁর "The electoral politics of West Bengal 1947 to 2021:A comparative study" গবেষণামূলক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ,পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলির অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টির বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনী পরিসংখ্যান ও তুলনামূলক আলোচনা। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে দুর্বল বিরোধী শক্তির উপস্থিতি ও সরকারের স্থায়িত্বের নিদর্শন।

যদিও এই সকল ও আরো অনেক গবেষণা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অগ্রগতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, সর্বোপরি স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার মূল্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তবে ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পশ্চিমবঙ্গের ১ম থেকে ৮ম বিধানসভা নির্বাচনের পটভূমি, প্রেক্ষাপট, কিংবা নির্বাচনী পরিনামের ভিত্তিতে শাসকের স্থায়িত্ব ও রাজনৈতিক দলের উত্থান পতনের ইতিহাস কেন্দ্রিক গবেষণা সীমিত। এই গবেষণা ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সেই শূন্যস্থান পূরণ করবে।

গবেষণার লক্ষ্য (Research Objectives)

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল-

1)স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের অগ্রগতিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

2)স্বাধীনতা উত্তর কংগ্রেসি আমলের নির্বাচন বা জোট সরকার আমলের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনামূলক আলোচনা কর।

3) ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিধানসভা নির্বাচনের পটভূমি ও ফলাফল বিশ্লেষণ করা।

4)পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী কৌশলের ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতির সামগ্রিক চরিত্র ব্যাখ্যা করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitive) বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। প্রাথমিক সূত্র অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদন, ও গৌণ সূত্র অর্থাৎ বিভিন্ন পুস্তক ও গবেষণা প্রবন্ধ থেকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (Historical Analysis), যেমন নির্বাচনী প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক পালাবদল এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) যেখানে কংগ্রেস ও জোট সরকার বামফ্রন্ট তৃণমূল সরকারের বিধানসভা নির্বাচন ও নির্বাচন কৌশলের তুলনামূলক আলোচনা দেখানো হবে।

পরিসংখ্যান মূলক বিশ্লেষণ (Statistical Analysis)ও প্রবণতা বিশ্লেষণের (Trend Analysis) এর মাধ্যমে ভোটের হার, আসন সংখ্যা, ভোট শতাংশ ও বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি ভোটের প্রবণতা, দলীয় উদ্যান পতনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা হবে। যা পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত বিধানসভা নির্বাচনের ইতিহাস বোঝার জন্য কার্যকর হবে।

মূল গবেষণা (Discussion)

প্রথম বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও তখন বঙ্গভূমি ভৌগোলিক দিক থেকে অপূর্ণ অবস্থাতেই রয়ে গেল। সর্বত্রভাবে দেশজুড়ে নানাবিধ সমস্যার

জর্জরিত দেশবাসি। এমত অবস্থায় ৩রা জুলাই ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১১ জন এর মন্ত্রিসভা গঠন করে শপথ নেন ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। কিন্তু প্রথম দিনেই প্রায় দু হাজার কৃষকের বিধানসভা অভিমুখে মিছিলের গতি পুলিশ মারফত রোধ করে , এবং পুলিশ দ্বারা নিরীহ কৃষকদের উপর লাঠি চার্জ করিয়ে তিনি বিতর্কের সম্মুখীন হন।

ডিসেম্বর মাসের স্পেশাল পাওয়ার বিল, সংশোধিত নাম (পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিল) পাশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী শক্তি থেকে ছাত্র সমাজ সরকারবিরোধী আন্দোলনে সরব হয়। ১৯৪৭ সালের ১০ ই ডিসেম্বর এই আইনের প্রতিবাদে , ছাত্র সমাজ যে আন্দোলন সংগঠিত করে, সেখানে পুলিশ ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালায়। পুলিশি তাণ্ডবের ফলে একজন অ্যাম্বুলেন্স কর্মী শিশির মন্ডল নিহত হন। উত্তেজিত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা কে উপেক্ষা করে পুলিশ এর উপর ইট পাটকেল ছুটে থাকে। ড. প্রফুল্ল ঘোষ এই নিন্দনীয় ঘটনাটিকে, সরকারকে কলঙ্কিত করার এক ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা বলে বাখ্যা দেন। বলা বাহুল্য যে কংগ্রেসের অনেক নেতৃত্বই এই আইনটিকে মেনে নিতে পারেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তা সত্ত্বেও এই আইনটি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯ ৬৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল । খাদ্য সমস্যা ও উদ্বাস্তু সমস্যা রাজনৈতিক উত্তেজনা ইত্যাদি কারণে এইমোত অবস্থায় মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের শাসন পর্বের অবসান ঘটলে, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতাদের অনুরোধে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ১৯৪৮ সালের ২৩ শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কার্যকার গ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তার শাসন পরিচালনার পথ কঠিন ছিল। কারণ একদিকে যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য দ্বন্দ্ব তেমনই অপরদিকে একাধিক গণঅভ্যুত্থান, খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, প্রভৃতির সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল। তিনি শাসন পরিচালনার জন্য ১২ জন সদস্য নিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই কংগ্রেস ছিল শ্রেণী সংগ্রামের চরম বিরোধী। এ প্রধান কারণ, কংগ্রেসের অনেক নেতাই উচ্চবিত্ত ও পুঁজিপতি। তাই নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেই তারা শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করত। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করলে পরে কংগ্রেস সরকার দমন প্রেরণ নীতি নিয়ে আসে। ১৯৪৮ সালের ২৬ শে মার্চ ব্রিটিশ আমলের বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনকে প্রয়োগ করে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। আর এই কার্যকলাপের জন্য একদিকে যেমন গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে, অন্যদিকে সরকার বল প্রয়োগ করে এই আন্দোলনের কন্ঠরোধ করার চেষ্টা করে। আবার প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সাথে ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের তেমন সুগভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মিল ছিল না।

তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তিকরণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম , ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর কোচবিহারে রাজা জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ভারতের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডা. রায়ের সরকার খাদ্য সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে হিমশিম খেতে থাকে। খাদ্য, কেরসিন, ও অন্যান্য অত্যাবশক জিনিসগুলি নিয়ে চরম কালোবাজারি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে । রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও এলাকায় জনসাধারণ ভূক-মিছিল শুরু করে। অনেক জায়গায় ক্ষুদার্থ মানুষেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোদ্ধার ও চোরাকারবারিদের মজুতের চাল ,কেরোসিন ইত্যাদি উদ্ধার করে বন্টন করতে থাকে। ১৯৫১ সালের একুশে এপ্রিল কোচবিহার শহরে পাঁচ হাজার মানুষের এক ভূকমিছিল বের হয়। এই মিছিলে মিছিলে র উপর পুলিশ বেপরোয়াভাবে লাঠিচার্জ করে। এমত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এরূপ বঞ্চনার ও ব্যর্থতার গান গেয়ে বাঙালি উদ্বাস্তু ও জনসাধারণের মাঝে বামপন্থীরা তাদের সংগঠন মজবুত করতে থাকে।

প্রথম বিধানসভার নির্বাচন (১৯৫২)

১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধান অনুসারে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সরকার এবং বিরোধী বামপন্থী দলগুলি উভয়ই প্রচার চালায় নিজেদের সমর্থনে। কংগ্রেস সরকার কৃষি ব্যবস্থার প্রসার, কুটির শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কথা কে তাদের ভোট প্রচারের হাতিয়ার করে। অপরদিকে বামপন্থী দলগুলি ব্যক্তি স্বাধীনতা ,শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, কৃষকদের ঋণ মুকুব, ও তাদের সরকারি ঋণ ও সেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া ,কর্মসংস্থান, দ্রব্য মূল্য হ্রাস, দুর্নীতি, কালেবাচারী দমন, ইত্যাদি বিষয়ে জনগণের সামনে তুলে ধরে তাদের নির্বাচনী প্রচারেরমাধ্যমে ।

বিরোধীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ছিল এই নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে শেষমেষ কংগ্রেস ২৩৮ টি আসনের মধ্যে ১৫০ টি আসন অর্থাৎ ৩৮.৮২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করে এবং প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি ২৮ টি আসন পায় এছাড়া জনসংঘ ৯টি আসন লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২৬ শে মার্চ কংগ্রেসের এক সভায় ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় দ্বিতীয়বার কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং ১১ই জুন, ১৯৫২ সালের তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

প্রথম নির্বাচন উত্তর পরবর্তীকাল থেকেই ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এই পর্বে শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠনের এক সদর্থক প্রয়াস চালান। কারণ তিনি বুঝেছিলেন ,পশ্চিমবঙ্গের আর্থসামাজিক উন্নতি ঘটাতে না পারলে , তাঁর রাজনৈতিক ফল হবে ভয়াবহ।

দূরদর্শী প্রশাসক ও সংগঠক হিসেবে তিনি জনগণের দৃষ্টি ফেরাতে বহু জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনায় হাত দেন। ১৯৫৩ সালের দামোদর ভ্যালি প্রকল্প এবং তার পাশাপাশি বোকারোতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন, কল্যাণী নগর নির্মাণ, এর সাথে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাত রাজ্য রাজনীতিতে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্প ও বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি এর পাশাপাশি তার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৯৫৪ সালে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা উদ্বোধন। অপরদিকে ১৯৫৫ সালে ফরাসিদের থেকে ছিনিয়ে আনা চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী খাদ্য সমস্যা ও উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজ্য রাজনীতিতে উত্তপ্ত আবহাওয়া কে জানান দিতে থাকে।

দ্বিতীয় বিধানসভা নির্বাচন(১৯৫৭)

১৯৫৭ সালের নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গের ২৩৮ টি থেকে ২৫২ টি আসন নিয়ে বিধানসভা গড়ে ওঠে। কংগ্রেস ১৫২ টি আসন অর্থাৎ ৪৬.১৪ শতাংশ ভোট

পেয়ে জয়লাভ করলেও কমিউনিস্ট পার্টি ততদিনে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬ টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য যে সিপিআই গ্রাম অঞ্চলে খুব একটা দাগ কাটতে পারেনি।

তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের এই পর্বের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ নবরূপে সেজে উঠেছিল। ১৯৫৮ সালে দণ্ডবরাণ্য পরিকল্পনা, হলদিয়া বন্দর পরিকল্পনা, হুগলি নদীর নব্যতা বজায় রাখতে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণ, এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ,যাদবপুর ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। অপরদিকে কলকাতায় সল্টলেক সিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়। বলাই বাহুল্য রাজ্যে পর্যটন শিল্পীর বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেও কলকাতা দিঘার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ, সড়ক সেতু নির্মাণের যোজনা ও বাধছিল না মুখ্যমন্ত্রীর শাসন পরিকল্পনায়। ১৯৬১ সালে তিনি বাংলা ভাষাকে সমস্ত সরকারি দপ্তরে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আইন পাস করান।

এই পর্বেও ডাক্তার রায় বিভিন্ন কংগ্রেস বিরোধী গন আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা উত্তরকালের শ্রমিক ও কৃষি আন্দোলন (১৯৬৮-১৯৬২), ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৫৯ সালে কেরালার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকারের উচ্ছেদে বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন, ইত্যাদি।

তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচন (১৯৬২)

১৯৬২ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস১৫৭ আসন অর্থাৎ ৪৭.২ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনরায় জয়ী হলেও গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীরা পূর্বের তুলনায় অনেকটাই সাফল্য লাভ করেছিল। বলা বাহুল্য ১৯৫০ এর দশক জুড়ে বিভিন্ন সমস্যা কে কেন্দ্র করে যেসব গন আন্দোলন গুলি চলেছিল তা অনেকাংশই কংগ্রেসের ভিত দুর্বল করতে এবং জন মানুষের বামপন্থী মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তৃতীয় নির্বাচনে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কংগ্রেস এর প্রতিপত্তি বজায় থাকলেও কোচবিহার, বীরভূম , বর্ধমান এ বামপন্থী প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সত্ত্বেও বামপন্থীদের সরকার গঠনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় সাংগঠনিক দুর্বলতা, চিন ও ভারত যুদ্ধের দরুন কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার, কংগ্রেস সরকারের দমনপীড়ন, প্রশাসনিক শক্তিকে নির্বাচনে ব্যবহার, নির্বাচনে কংগ্রেসের দেদার অর্থব্যয়, ইত্যাদি। ১৯৬২ সালে এই কমিউনিস্ট পার্টি ই আদর্শগত দিক থেকে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ তে তৃতীয় বিধানসভা নির্বাচনে জয় লাভের পরেও ওই বছরেই ১লা জুলাই ডাঃ রায় তাঁর ৮১ তম জন্মদিনেই মৃত্যুবরণ করেন।

চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

১৯৬২ সালে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, তিনিই প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি জনদরবার করতেন। জনগণের সাথে চর্চার মাধ্যমে নানা সমস্যা সমাধানের প্রয়াস করতেন। উল্লেখ্য তিনি বিধানসভার অধিবেশনে ও বাংলায় বক্তব্য রাখা শুরু করেছিলেন, তিনি প্রতি জেলায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে জেলার বিশেষ সমস্যা গুলি সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসে। তাঁর এই কর্মসূচি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ইতিমধ্যেই ১৯৬৪ সালে আদর্শগত বিভেদ ও দলীয় অন্তদ্বন্দ্বের কারণে বামপন্থা থেকেই জন্ম নেয় সিপিআইএম দল। তারা প্রথম থেকেই বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। আবার ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের প্রভাব পড়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির ওপর। কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও তখন অন্তরদন্ত প্রবল। সর্বোপরি ১৯৬৬সালে খাদ্যসংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করলে বাংলার রাজনীতি আবার তোলপাড় হয়ে ওঠে। খাদ্য সংকট মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এর কাঁচা কলা

খাওয়ার প্রস্তাবের প্রসঙ্গকে কটাক্ষ করে বিরোধীরা ব্যঙ্গ করতে থাকে। ওই বছরই অজয় মুখার্জির নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস বলে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। এখানে প্রণব মুখার্জি, সিদ্ধার্থ শংকর রায়, গনি খান চৌধুরী, আভা মাইতি, সুশীল কুমার ধরার মতো ব্যক্তিরা এক যোগ হয়ে প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হন। গবেষকদের মতে বাংলা কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেসের ভিতকে কিছুটা হলেও নাড়িয়ে দিয়েছিল গভীরভাবে। সংগঠন ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সেন। দিকে দিকে খাদ্য আন্দোলনে সরব হয়ে উঠেছিল শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী। তারপরেই এলো ১৯৬৭ সালের চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন।

চতুর্থ বিধানসভা নির্বাচন (১৯৬৭)

সমগ্র রাজ্য তখন আন্দোলনে জর্জরিত, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এই সময় তার নির্বাচন কেন্দ্র আরামবাগে পরাজিত হন অজয় মুখার্জির কাছে। কংগ্রেস ১২৭ কি আসন অর্থাৎ ৪১.১৩ শতাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করলেও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার স্থাপন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যুক্তফ্রন্ট ছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি রাজনৈতিক জোট যা ১৯৬৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পরপরই গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা কংগ্রেস, সহ সংযুক্ত বামফ্রন্ট এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে এটি গঠিত হয়েছিল।

পঞ্চম , ষষ্ঠ বিধানসভা নির্বাচন ও রাজনৈতিক অস্থিরতা (১৯৬৯, ১৯৭১)

বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জি ছিলেন যুক্তফ্রন্টের প্রধান, এই সময় তাই অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী ও কমরেড জ্যোতি বসু উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এইসময় কলকাতায় যুক্তফ্রন্টের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে ,ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ১৮ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করা হয়। মন্ত্রিসভা ১৯৪৭ সালের ১৫ই মার্চ শপথ গ্রহণ করার পরেই পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন কে বাতিল বলে ঘোষণা করে দেয়। যুক্ত ফ্রন্টের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগগুলি নেয়া হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংকট মোকাবিলা, শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, দুর্নীতি, কালোবাজারি ও বেকারত্ব সমস্যা সমাধান, নারী ও তপশিলি জাতির উন্নতি সাধন, পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠন ইত্যাদি।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত করা ছিল যুক্তফ্রন্টের কাছে এক অসাধ্য কাজ। যেখানে বিরোধীদল হিসেবে যুক্তফ্রন্ট বারবার খাদ্য সংকট নিয়ে কংগ্রেসকে তীব্র সমালোচনা করেছে , এখানে শাসক হিসাবে ও খাদ্য সমস্যা মোকাবিলায় নিত্যদিন ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে থাকে যুক্তফ্রন্ট। সেখান থেকেই জোট রাজনীতিতে ভাঙ্গনের সূত্রপাত দেখা দেয় ।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সুশীতল চৌধুরীর নেতৃত্বে নকশালবাড়ি কৃষক বিদ্রোহ রাজ্য রাজনীতিকে তোলপাড় করতে শুরু করেছে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের ঘেরাও আন্দোলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

এমত অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি নিজেই রাইটার্স বিল্ডিং এর সামনে কার্জন পার্কে অনশন ধর্মঘটে বসেন। বামপন্থীরা তাকে কটাক্ষ করতে থাকে। এমতাবস্থায় ডক্টর প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ তার খাদ্যমন্ত্রীর পথ থেকে পদত্যাগ করে যুক্তফ্রন্টের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। তিনি আইনসভায় ১৬ জন সদস্যের সাথে মিলে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নামে একটি নতুন দল গঠন করে নিজস্ব সরকার গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তদানীন্তন রাজ্যপাল ধর্মবীর মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে দুই সপ্তার মধ্যে বিধানসভা অধিবেশন আহ্বান করার নির্দেশ দেন। অজয় মুখার্জি রাজ্যপাল কে জবাব দেন যে তিনি তা করতে অক্ষম। ১৬ই নভেম্বর রাজ্যপাল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি দেন। জাতীয় কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বার্থে ঘোষকে সমর্থন জানায়। তদানীন্তন এই রাজ্যপাল ধর্মবীর মহাশয়ের এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতার ব্রিগেডে একটা গণসভাবের ডাক দেয় যুক্তফ্রন্ট, এই সভা ভঙ্গে পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলে পশ্চিমবঙ্গের দুদিন সাধারন ধর্মঘটের ডাক দেয় যুক্তফ্রন্ট,হিংসার দাবানল ছড়িয়ে পড়ে বাংলা জুড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন তখন নকশালবাড়ি ছেড়ে ছাত্র সমাজের মননে প্রবেশ করেছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাও এর আদর্শ ছাত্র সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেছে। অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে শুরু হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতার এক জাতীয় আন্দোলন। রক্তাক্ত তখন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশ। আবারো হিন্দু শরনার্থীর ভিড় পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। এইরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সরকারের পতন ঘটে এবং রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়।

এক এক বছর পাঁচ দিন রাষ্ট্রপতি শাসন চলার পর রাজ্যে পঞ্চম বিধানসভা নির্বাচনের দ্বারা ১৯৬৯ সালে পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে অজয় মুখার্জি ও জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে ফ্রন্ট সরকার স্থাপন হয়। এ সময় জোট সরকার ২১৪ টি আসন নিয়ে বিপুল জয় লাভ করে। সিপিআইএম সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়ার পরেও তারা অজয় মুখার্জিকে মুখ্যমন্ত্রী আসনে আহ্বান করেন। গতবারের ১৮ দফা কর্মসূচির পর এবারে ৩২ টি কর্মসূচি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের নেতা অজয় মুখার্জি শাসন পরিচালনার ময়দানে নামেন।

কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাত্র ১৩ মাসের শাসনকালেই এই সরকারের পতন ঘটে। পুনরায় রাষ্ট্রপতি শাসনের স্থিতি জাগ্রত হয়ে ওঠে।

১৯৭০ সালের ১৯শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত আবারো এক বছরের উপর রাষ্ট্রপতি শাসন চলে পশ্চিমবাংলায়।

এরপর গণতান্ত্রিক জোটের মাধ্যমে পুনরায় অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন কিন্তু এবারেও তার মেয়াদ ছিল মাত্র তিন মাসের মতো। ১৯৭১ সালে কংগ্রেস ১০৫ টি আসন অর্থাৎ ২৯.২ শতাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করে ।সরকার চালাতে বারংবার ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ বলা যেতে পারে বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মতবিরোধ । যদিও পূর্ব পাকিস্তান বিদ্রোহের দাবানলের আগুন এই বাংলার রাজনীতিকে এই সময় উত্তপ্ত করেছিল এটা অস্বীকার করা যায় না।

১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ক্রমশ হিংসাত্মক আকার ধারণ করে। ইতিপূর্বেই ১৯৭০ সালের ১৭ই জানুয়ারি বর্ধমানের সাইবাড়ি নির্মম হত্যাকাণ্ড, ১৯৭০ সালের ১৯শে নভেম্বর বারাসাত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে হিংসার এক মর্মান্তিক উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলা কংগ্রেস প্রার্থী দেবদত্ত মন্ডল, ২০ শে ফেব্রুয়ারি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী হেমন্ত কুমার বসু, ও ৫ ই মার্চ দমদম বিধানসভার জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী পীযূষচন্দ্র ঘোষ ও রাজনৈতিক হিংসার বলী হন ।

১৯৭১ সালেই আগস্টে বরানগর কাশিপুর এলাকায় এক ভয়ংকর গণহত্যা হয়। যদিও ১৯৭১ সালের ২৯ শে জুন থেকে ৭২ সালের ২০শে মার্চ পর্যন্ত আবারো এক বছরের রাষ্ট্রপতি শাসন চলে পশ্চিমবাংলায়। এই সময় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে আনতে তথা বাংলাদেশ গঠনের পূর্ণ সহায়তা করে ভারত।

সপ্তম বিধানসভা নির্বাচন প্রেক্ষাপট

পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন বাংলার রাজনীতি পূর্ণ বিষয়বস্তু বুঝতে বুঝতে অবাক হয়ে উঠেছিল। কেননা নিত্যদিন যেন সরকার করছে আর ভাঙছে সাধারণ মানুষের কাছে এটা বোঝা দুষ্কর হয়ে উঠেছিল যে এই বাংলার শাসন চালাচ্ছে কে ? এরই মাঝে ৭২ সালের নির্বাচনে ঘন্টা বেজে উঠলো, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জয়লাভের ফলে ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তা তখন শীর্ষে।

নির্বাচনী মূলত দুটি প্রতিপক্ষ ছিল কংগ্রেস (আর) ও সিপিআইয়ের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট। যার মুখ্য নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থ শংকর রায় এবং সিপিআই নেতা বিশ্বনাথ মুখার্জি।

সপ্তম বিধানসভা নির্বাচন (১৯৭২)

এই নির্বাচনে কংগ্রেস আর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। কংগ্রেস ২১৬ টি আসন অর্থাৎ ৪৯.৮ শতাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করে । সিদ্ধার্থ শংকর রায় মালদা ও আসন থেকে জয়লাভ করে মুখ্যমন্ত্রী পদে স্বীকৃতি পান।

এই নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নির্বাচনের ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ।

অষ্টম নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

১৯৭২ সালে সপ্তম বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে সিদ্ধার্থ শংকর রায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এক নব কাঠামো গঠন করেন যা তার কার্যকালের সবচেয়ে বড় সাফল্য। ১৯৭৩ সালে পঞ্চায়েত আইন পাস করানোর ক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই আইনের মাধ্যমে ই পূর্বের চারস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা , ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এই পর্বের শাসনকালে গার্ডেনরিচের জল শোধনাগার স্থাপন করা হয় এবং কলকাতার মেট্রো কাজ এই সমতেই শুরু হয়। সিদ্ধার্থ শংকর রায় তাঁর কার্যকালে বিচারক ওয়াঞ্চুর সহায়তায় একটি ওয়াংচু কমিশন গঠন করেন, এই কমিশনের মূল্য উদ্দেশ্য ছিল মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের দুর্নীতি দমন করা।

তাঁর আমলে বহু শরণার্থী ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এলে তিনি পুনর্বাসনের জন্য সচেষ্ট হন। তাঁর সময়ে রাজ্যে ধান উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়। বেকারত্ব সমস্যা সমাধানেও তিনি উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে নকশাল আন্দোলনকে বিনষ্ট করতে তিনি উঠেপড়ে লেগেছিলেন, ১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই নকশাল আন্দোলনের প্রধান চারু মজুমদারকে গ্রেফতার করা হয়। ১২ দিনের মাথায় আলিপুর জেলে তিনি মারা যান। সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী জানা যায় তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। কিন্তু নকশাল পন্থীরা এই ঘটনাকে গুপ্ত হত্যা বলেই মনে করেন, রাজ্য রাজনীতি আবার তোলপাড় হয়ে ওঠে। এই আমলে পুলিশি দমন প্রেরণ শাসন যন্ত্রের অনবদ্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করে। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উপরেও চলেছিল

বর্বরচিত অত্যাচার। ১৯৭৫ সালে ইমারজেন্সি ও সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের পরামর্শ ছিল বলে মনে করেন গবেষকরা।ইমারজেন্সির সময়েও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশি আইন ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে অসংখ্য নকশাল পন্থীদের এনকাউন্টার করে হত্যা করেন।

সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের শাসনের শেষের দিকে বাংলার অর্থনীতির ভিত ক্রমশ নড়বড়ে হতে শুরু করে। এই দশকের মাঝামাঝি বাংলায় বসন্ত রোগের কারণে মহামারীর ফলে অসংখ্য মানুষ বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। এমত অবস্থায় ১৯৭৭ সালে মার্চ মাসে কেন্দ্রে নবগঠিত জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতবর্ষের নয়টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই নয়টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল অন্যতম। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনের পূর্বে ৩০ এপ্রিল থেকে ২০ শে জুন পর্যন্ত ৫১দিন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন চলে। এরপর বাংলার গণতন্ত্র ১৯৭৭ সালে নির্বাচন অভিমুখে পা বাড়ায়।

অষ্টম বিধানসভা নির্বাচন (১৯৭৭)

১৯৭৭ সালে নির্বাচন পূর্বে সিপিআইএম এবং জনতা পার্টির মধ্যে জোট গঠনের একটা প্রাথমিক আলোচনা পর্ব চলে। কিন্তু বিপরীত রাজনৈতিক মতাদর্শগত ও অন্যান্য কারণে জোট গঠন অসম্ভব হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয়, যার একদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদ) এর নেতৃত্বে বামপন্থী জোট অপরদিকে জনতা পার্টি ও কংগ্রেস (আর)।

এই নির্বাচনের ফলাফল বামপন্থের জন্য ছিল অপ্রত্যাশিত। বামফ্রন্ট ২৯৪ টি আসনের মধ্যে 293 তে প্রার্থী দিতে সক্ষম হয়েছিল। যার মধ্যে ২৩১ টি আসন অর্থাৎ ৪৫.০৮ শতাংশ মানুষের জনসমর্থন পেয়ে জয়লাভ করে। কংগ্রেস মাত্র ২০টি আসন অর্থাৎ ২৩.০২ শতাংশ মানুষের সমর্থন লাভ করে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে কমরেড জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হন।

বাংলার রাজনীতিতে দীর্ঘ কংগ্রেস আধিপত্যের পতন ঘটে। শুরু হয় বামপন্থা উত্থানের এক নতুন অধ্যায়, বাংলার রাজ্য রাজনীতি লাল ঝান্ডার তলদেশ থেকেই পরিচালিত হতে শুরু করে।

উপসংহার (conclusion)

১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচন যেমন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পতন এবং বামপন্থা শাসনের উদ্ভব ও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই গবেষণায় ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ১৯৫২ সালের প্রথম বিধানসভা নির্বাচন থেকে ১৯৭৭ সালের অষ্টম বিধানসভা নির্বাচনের ক্রমপর্যায়ে প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের পাশাপাশি নির্বাচনের ফলাফলের উপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলাপতলের অগ্রগতিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনী কৌশলের ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের আলোচনার পাশাপাশি কংগ্রেস ও বামপন্থা উভয় শিবির এই মতাদর্শক বিভেদের কারণে দল ভাঙ্গন ও তা নির্বাচনী রাজনীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা বর্ণনা করা হয়েছে। এই গবেষণা পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাস চর্চায় সমসাময়িক ইতিহাসবিদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং নীতি নির্ধারকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

1. Bala, Babulal. (2020) Congress in the Politics of West Bengal: From Dominance to Marginality (1947–1977).
2. Chatterji, Rakhahari, and Partha Pratim Basu, eds. West Bengal under the Left, 1977–2011. Abingdon: Routledge.
3. Chakrabarty, Bidyut. (2008). Indian Politics and Society Since Independence: Events, Processes and Ideology. London: Routledge.
4. Samaddar, Ranabir. (2013). Passive Revolution in West Bengal: 1977–2011. New Delhi: SAGE Publications India Pvt Ltd.
5. Bhattacharya, Soumen. "The Electoral Politics of West Bengal Since 1947–2021: A Comparative Study." International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) 8, no. 4 (October 2021): 524–532.
6. Bhattacharyya, Dwaipayan. Government as Practice: Democratic Left in a Transforming India. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
7. Das, Manas Kumar. Contemporary History of India (1947–2010). India: DDCE, n.d.